

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু’

শিক্ষা

গোলাম ফারুক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয় মৃত বা মৃতপ্রায়—বেশি দিন আগের কথা নয়, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার নায়ীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম ও মনোভাব পর্যালোচনা করে ২০১০ ও ২০১৫ সালে প্রকাশিত দুটি নিবন্ধে ব্রিটিশ তাত্ত্বিক টেরি ইগলটন এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেননি যে উন্নত দেশগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাকচিক্য কিংবা ধনদৌলতে ঘাটতি পড়েছে। বরং তা আরও বেড়েছে। ঘাটতি পড়েছে মানবিক বিদ্যাশিক্ষায়। আধুনিক পুঁজিবাদের তত্ত্ববাহক হতে গিয়ে মানবিক বিষয়গুলো শিক্কে তুলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন ‘করপোরেট প্রশিক্ষণকেন্দ্র’ কিংবা ‘করপোরেট গবেষণাকেন্দ্র’ পরিণত হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আমরা যদি দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব ইগলটন যে অর্থে বলেছেন সে অর্থে তো বটেই, স্বাভাবিক অর্থেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মৃতপ্রায়। উচ্চমাগী শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত তো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণকদের নেই-ই, এমনকি টাকাকড়ি নিয়ে আসতে পারে, এ রকম শিক্ষাও তাদের কাছে গরিবের খোঁজারোগ বলে ভ্রম হয়। কেন এ রকমটা ঘটে, কেনই-বা এ রকম ঘটা উচিত নয় আর কী করলে উচ্চশিক্ষা, ইগলটন কথিত সেই মর্যাদা না পেলেও, অন্তত সাধারণভাবে বেঁচে থাকবে।

বিষয়টা কি এমন যে উচ্চশিক্ষার চাহিদা নেই বলে রাষ্ট্র পরিচালকেরা একে উপেক্ষা করেন? বরং প্রচুর চাহিদা আছে এবং তা পূরণ করতে গিয়েই দরিদ্র ও ক্ষেত্রবিশেষে অপরিণামদর্শী সরকারগুলো শিক্ষার মানের সঙ্গে আসন্ন করে। দেখা যাক চাহিদাটা কেমন। প্রথমত, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ এশিয়ায় বাস করে। উপরন্তু, তাদের অধিকাংশই তরুণ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ৬১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ১৮ বছরের নিচে)। স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদের আবহে বেড়ে ওঠা এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী উদ্যমী ও ইগলটনের অর্থে না হলেও, শিক্ষাপিপাসু। এই এলাকার মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সন্মানজনক। এমনকি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত ধনবান ও ক্ষমতাসালী লোকেরাও নিজেদের নামের পাশে ‘বিএসসি’ লিখে সন্মানিত বোধ করেন। এতদঞ্চলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বাড়ার আরও কারণ হচ্ছে স্থলপুঁজী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ ধারণা, দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষি খাতের তুলনায় শিল্প ও সেবা খাতের উন্নতি।

চাহিদার তুলনায় আর্থিক অসংগতিই কি উচ্চশিক্ষায় ধস নামার একমাত্র কারণ? তা নয়। বরং উচ্চশিক্ষাই হতে পারে আর্থিক সচ্ছলতা লাভের কার্যকর ও টেকসই হাতিয়ার। সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিলে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই সরকারগুলো উচ্চশিক্ষার ইগলটনের ভাষায় ‘জীবন’ দান করতে না পারলেও লাভজনক করতে পারে। একটি দেশের সরকার যদি গবেষণায় বিনিয়োগ করে, সে দেশের অর্থনীতি চাড়া হতে সময় লাগে না। রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টে ১ শতাংশ অগ্রগতি হলে উৎপাদন বাড়বে ০.০৫ থেকে ০.১৫ শতাংশ। ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) দেশগুলোর অভিজ্ঞতা আরও চমকপ্রদ। সেখানে উচ্চশিক্ষায় প্রতিটি ডলারের বিনিয়োগ সুদে-আসলে ফেরত এসেছে। সেখানকার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষিত মানুষের উপার্জনে পার্থক্য হয় প্রায় ২৫ থেকে ১১৯ শতাংশ। যদি কোনো দেশের নাগরিকেরা



এক বছর বেশি পড়ার সুযোগ পায়, সে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ থেকে ৬ শতাংশ বেড়ে যায়। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গ্র্যাডুয়েট দিয়ে আর আধুনিক অর্থনীতিকে সামলানো সম্ভব নয়।

উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগে আত লাভ হয় না। তবে তা কেবল ইগলটনের ‘উচ্চশিক্ষার’ ক্ষেত্রে খাটে, বিশ্ববিদ্যালয়রূপী ‘করপোরেশন প্রশিক্ষণকেন্দ্র’ বা ‘করপোরেশন গবেষণাকেন্দ্রের’ ক্ষেত্রে খাটে না। আমার ধারণা, দক্ষিণ এশিয়ার কর্তব্যাক্রিয়া হয় এই দুই ধরনের উচ্চশিক্ষার পার্থক্য সন্ধ্যক উপলব্ধি করতে পারছেন না অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষকেরা যে উচ্চশিক্ষাকে লাভজনক করতে পারবেন, এ রকম ভরসা পাচ্ছেন না। তাই গবেষণার এত আকাল। মজার ব্যাপার হচ্ছে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা থাকলেও পাকিস্তানি গবেষকেরা এ ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে গেছেন। যেমন ২০০২ সালে ওই দেশের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ছিল ৮০০ আর ২০১১-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ২০০-তে (অবশ্য তাদের মান নিয়ে অনেকের সংশয় আছে)। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নেপালে। মাত্র ১ শতাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিএইচডি প্রদান করে।

এসব কারণেই দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ পিছিয়ে আছে। আমরা যদি ২০১২-১৩ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব টিএইচই (টাইমস হায়ার এডুকেশন) র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই অঞ্চলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। তবে প্রথম ৪০০টির মধ্যে ভারতের তিনটি আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) আছে। আর কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতের চারটি আইআইটি এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের ‘ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি’

স্থান পেয়েছে। অন্য দেশগুলোর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান খুবই হতাশাজনক।

সরকারগুলোর (ভারত ছাড়া) পক্ষ থেকে এই হতাশাজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলেও বেসরকারি খাত এগিয়ে আসছে। তৈরি হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আর উচ্চবিত্ত, এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা চলে যাচ্ছে বাইরে। যেমন ২০১১-১২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারত থেকে ৫৯ হাজার, বাংলাদেশ থেকে ২ হাজার ৪১, নেপাল থেকে ২ হাজার ৮২২, পাকিস্তান থেকে ১ হাজার ৯০০ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে ১ হাজার ৪১২ জন পোস্টগ্র্যাডুয়েট ছাত্র কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গেছে।

এখন দেখা যাক দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে কীভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ হয়েছে। এই অঞ্চলে ১৯৮০-এর দশকে যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না, মাত্র দুই দশকে তার ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। যেমন ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৯ শতাংশ বেসরকারি (এখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরা হয়নি) এবং তা দ্রুত বিকাশমান। আফগানিস্তানের অবস্থাটাও অনেকটা একই রকম। আনুপাতিক হারে এই দুটি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধির হার প্রায় সমান সমান এবং এতদঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। এরপরেই পাকিস্তানের অবস্থান। ওখানে ৪৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। তবে ওখানকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি সরকারি টাকায় চলে না। প্রচুর বিনিয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ২০০৮-এর পর সরকার হঠাৎ করে এক বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বাজেট ৮৩ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এখন ওদের ট্রাস্টি বোর্ড ছাত্র-বেতন এবং কিছু বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে অর্থসংস্থান করে। ভারতে ৩৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। নেপাল ও শ্রীলঙ্কা সরকারি

বিধিনিষেধের কারণে বেসরকারি খাতটি এখনো বিকশিত হয়নি।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভারতে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কম, তার কারণ সরকারি বিনিয়োগ। দেশটির ১১তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষা খাতের বরাদ্দ নয় ৩৭ বাড়ানো হয়েছে। সেখানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রের পেছনে সরকারি ব্যয় সবচেয়ে বেশি—জিডিপি পার ক্যাপিটার ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ (২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী)। বাংলাদেশে সবচেয়ে কম ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী); নেপালে ৩৯ দশমিক ২ শতাংশ (২০১০) ও শ্রীলঙ্কায় ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ (২০১০)। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের হিসাব পাওয়া যায়নি।

এবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসা যাক। উপর্যুক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যদি উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের সূচক হয়, তাহলে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে এগিয়ে আছে; যদি ছাত্র-বেতনে ভর্তুকি দেওয়ার বিষয়টি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রণোদনা মনে করা হয়, তাহলে শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশ এগিয়ে আছে; যদি উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বা উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা উচ্চশিক্ষা বিকাশের পূর্বশর্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে; যদি জিডিপি বৃদ্ধির হার উচ্চশিক্ষার সহায়ক হয়, তাহলেও বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পরেই। সাম্প্রতিক কালে কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরও, বাংলাদেশে পিছিয়ে আছে মূলত সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

সরকারি বিনিয়োগ কমানোর অর্থ হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা আরও প্রকট। প্রথমত, এরা ছাত্র-বেতনের ওপর নির্ভর করে, বিদেশের মতো ফান্ড দিয়ে সাহায্য করবে এ রকম বড় করপোরেট পুঁজি এখনো দেশে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, সম্ভবত অর্থভাবেই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম যা যা প্রয়োজন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা নেই। তৃতীয়ত, পদোন্নতির জন্য কিছু নামকাওয়াতে গবেষণা হলেও সরকারি বিধিনিষেধের কারণে এরা পিএইচডি/এমফিল কোর্স চালু করতে পারেনি। চতুর্থত, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় অবস্থাপন ও মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক দরিদ্র ও কম মেধাবী ছাত্ররা এখানে ভর্তি হয়। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এ রকম: যাদের সরকারি ভর্তিকির (প্রায় ৯০ শতাংশ) দরকার নেই, তারাই তা ভোগ করে আর যাদের দরকার তারা ক্ষেত্রবিশেষে জায়গাজমি বিক্রি করে কোনোরকমে লেখাপড়া চালিয়ে যায়।

এ রকম অবস্থায় বড়জোর বিশ্ববিদ্যালয়মুখী কিছু বেসরকারি ‘করপোরেট প্রশিক্ষণকেন্দ্র’ তৈরি হতে পারে, ‘করপোরেট গবেষণাকেন্দ্র’ নয়। এখন হয় সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে, নাহয় ভারতের মতো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিনিয়োগ বাড়তে হবে। তবে পাকিস্তানের মতো খালি বিনিয়োগ বাড়ালেই হবে না, দেখতে হবে এই বিনিয়োগ যেন যোগ্য প্রশাসক ও মেধাবী ছাত্র-শিক্ষকের হাতে পড়ে লাভজনক হয়ে ওঠে—প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাবলম্বী হয়। তাতে ইগলটনের ‘মৃত্যু’ এড়ানো যাবে কি না বলা মুশকিল, তবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে অন্তত লাভজনক করপোরেট গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

- তথ্যসূত্র
১। Higher education in South Asia (২০১৩), দ্য ইকোনমিস্ট
২। Higher education across Asia (২০১১), এডিবি

● গোলাম ফারুক: ফলিত ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক, অধ্যাপক।
faruk.golam@yahoo.com